প্রতিধ্বনি the Echo
A Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: www.thecho.in

বাল্মীকি ও মধুসূদন : রাম ও রাবণ

অনিতা গোস্বামী (যশ)

Abstract

Balmiki's Ramayana, the great Indian epic, is the hallmark of Indian culture and tradition. The Ramayana is the story of devotion and sublime feelings and 'Meghanad Vadh' by Madhusudhan Dutta is the modern version of this epic dimension. 'Meghanad Vadh' is a colossal effort at capturing the renaissance spirit prevalent in Bengal during the 19th century. This article is a comparative study of the two protagonists of both the epics – Rama and Ravana.

The essence of Balmiki's Ramayana is the titanic clash between gods and demons; but it is the conflict between man and man which is what lies at the core of 'Meghanadh Vadh'. Here Rama is human with his share of glories and imperfections and Ravana, the grand fellow. Here in this epic fortitude and mortality, valour and affection are all intermingled into creating a whole new perception.

This work is a probe in to the differences that lie in the hearts of the two protagonists of the two epics of two different times.

রামায়ণ এবং মহাভারত ভারতবর্ষের জাতীয় মহাকাব্য। এদের মধ্যে রামায়ণকে অভিহিত করা হয় গার্হস্থ্য জীবনের মহাকাব্য রূপে। মহাভারতের সঙ্গে রামায়ণকেও ভারতীয় সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ এবং ভারতীয় সংস্কৃতির স্তম্ভ রূপে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর্য সংস্কৃতির রেখাচিত্র রামায়ণে লক্ষ্য করা যায়। রামায়ণে আছে একদিকে সুমহান কর্তব্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, অন্যদিকে ভাবের স্বর্গীয় মাধুর্য। ভারতবর্ষের সনাতন ভাবধারা, সমগ্র জাতির দৈনন্দিন জীবনের বিস্তৃত পরিচয় এর মধ্যে নিহিত আছে। আমাদের অতীত ঐতিহ্য ও যুগ যুগান্তরের সাধনার বাণী রামায়ণে বিধৃত আছে। এই বিশাল মহাকাব্য সম্পর্কে বলা যায়, এটি সমগ্র ভারতীয় জীবনাদর্শের মূল প্রতীক। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাবাদর্শ রামায়ণের বিভিন্ন কৌণিক বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়ে বর্ণচ্ছটা বিস্তার করেছে সমগ্র দেশময়।

লোককথায় প্রচলিত রামকথাকে অবলম্বন করে আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ মহাকাব্য রচনা করেছেন। আর ঊনবিংশ শতকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাল্মীকির সেই রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ৮৫ থেকে ১০১ সর্গে বর্ণিত অংশটুকু সূত্রাকারে গ্রহণ করে তাঁর বিখ্যাত 'মেঘনাদবধ' কাব্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদের আলোচনার

কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে অতীত ও বর্তমান কালের পৃথক শ্রেণীর দুই মহাকাব্যের দুটি প্রধান চরিত্র রাম ও রাবণ। বাল্মীকির রামায়ণে আর্য সভ্যতা ও আর্যসমাজের ব্যাপ্তি ও সমুন্নতির প্রতি কবির উৎসুক দৃষ্টি সদাজাগ্রত ছিল। আর্য রাজতন্ত্রের মহত্তম মানব রামচন্দ্রের চরিত্র চিত্রণের আকাঙ্ক্ষা রামায়ণে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তার একদিকে আছে সুমহান কর্তব্যের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ, অন্যদিকে ভাবের স্বর্গীয় মাধুর্য। যেখানে কর্তব্যবোধ জাগ্রত সেখানে সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা মানবহৃদয়ে কোনোকিছুই রেখাপাত করতে পারে না; রাজ-অন্তঃপুরের বেদনাময় কোনো আর্তিই তাঁকে বিচলিত করতে অক্ষম। সেজন্যে বলা যায় যে, বাল্মীকির কাব্যে পুরুষকার আছে, আছে কৃচ্ছ্রপূর্ণ দুঃসাধ্য কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা। কিন্তু মানবিকতা সেখানে দুর্বলতার অপবাদে বহুক্ষেত্রে নির্বাসিত। বাল্মীকির রামায়ণ মানবজীবনের কাহিনী নয়, দেবতার সঙ্গে রাক্ষসের যুদ্ধ কীর্তিই বর্ণিত। রামচন্দ্র সেখানে যতটুকু দশরথাত্মজ, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আর্যকুলতিলক রঘুপতি। আর রাবণ দশমাথা কুড়ি হাতের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা-রূপী রাক্ষস রূপে চিরজাগ্রত হয়ে আছে। সেজন্যে বাল্মীকির কাব্যে ওজস্বিতা থাকলেও সহৃদয়তা আছে কম।

ক্লাসিককাব্য ও মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের ছেলেবেলা থেকেই ছিল। ক্লাসিক কাব্যের মূল লক্ষণ হল নৈর্ব্যক্তিক চেতনা; আধুনিক মহাকাব্যের মূল ব্যঞ্জনা হল ব্যক্তিত্বচেতনা। মেঘনাদবধ আধুনিক মহাকাব্য; কিন্তু তা আবার প্রাচীনও বটে। এর বিষয়বস্তু পৌরাণিক বলেই নয়; রূপ-রঙ-গন্ধের বিচারে তা অতীতেরও। তাই মেঘনাদবধে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের সমন্বয় দেখা যায়। বাল্মীকির পৌরাণিক কাহিনীকে সূত্র রূপে গ্রহণ করে মধুসূদন তাঁর কাব্যে ঊনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁসের নূতন মূল্যবোধকে জাগ্রত ও উৎসারিত করার সাধনা করেছেন। কবির দৃষ্টিতে রাম তো মানুষ বটেই, রাবণও এক অপূর্ব মানুষ, -- 'Grand Fellow' । পুত্র মেঘনাদের সহযোগিতায় রাবণ ত্রিভুবন বিজয়ী সম্রাট। স্বর্গের দেবতারাও রাবণের ভয়ে ভীত, সদা সন্ত্রস্ত। রাবণের এই বীরত্বের মধ্যে অপার মহিমা থাকলেও তাতে কিন্তু অভিনবতা বা অপূর্বতা নেই। শুধুমাত্র বীর বলেই মধুসূদনের কাছে রাবণ 'Grand Fellow' নয়; সেই বীরত্বের সঙ্গে মানবত্ব, শৌর্যের সঙ্গে স্নেহ-প্রেম-বাৎসল্য গ্রথিত হয়ে আছে বলেই রাবণ অপূর্ব মানুষ। ত্রিভুবন বিজয়ী সম্রাট হয়েও রাবণ একজন স্নেহময় পিতা। তার শূরধর্মের সঙ্গে হৃদয়ধর্মও একাত্মতা লাভ করেছে। বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে এখানে রয়েছে মেঘনাদবধ কাব্যের আমূল পার্থক্য। অতীতের লঙ্কা ও রাবণের সঙ্গে নবযুগের নবীন মানবচেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য যুক্ত হয়ে এক অভিনব সৃষ্টি হয়ে উঠেছে মেঘনাদবধ। মধুসূদন আধুনিক জীবনামৃত পান করিয়েছেন প্রাচীনের দেহপাত্রে, যা একইসঙ্গে দেহ ও প্রাণের মতই অনন্য।

বাল্মীকি রামায়ণের প্রধান চরিত্র হল রাম। সেই রামের চরিত্র যেমন বিশাল, তেমনি জটিল এবং বিস্ময়কর। বিষ্ণুর অবতার হয়েও নিজেকে তিনি মানুষ বলে মনে করেন। আদি কবি তাঁকে সুমহান আদর্শবান মানুষ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু ঊনিশ শতকের রেনেসাঁসবিদ্ধ কবি মধুসূদন শিল্প ও সৌন্দর্যের নতুন মূর্তি রচনার দুর্বার প্রেরণাতে রামচন্দ্রের পরিবর্তে রাবণের প্রতি অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন মেঘনাদবধে আপাতদৃষ্টিতে রামচন্দ্রকে 'ভিখারী' রূপে এবং ভীরু ও আত্মপ্রত্যয়হীন চরিত্ররূপে অঙ্কন করায় বাল্মীকির মহানায়কের অমর্যাদার পরিচয় হয়তো আমাদের চিরন্তন বিশ্বাস ও সংস্কারকে ক্ষুণ্ণ করে বিড়ম্বিত করে। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সমালোচকদের মেঘনাদবধের কঠোর সমালোচনা হয়তো বা আমাদের মধুসূদন সম্পর্কে

ভুল ধারণায় পৌঁছে দেয়। উদাহরণ রূপে তাঁরা উল্লেখ করেছেন মেঘনাদবধের দু-একটি প্রসঙ্গের কথা। যেমন ৩য় সর্গে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রমীলার শৌর্য দেখে 'যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি!' অথবা ৬ষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের বিরুদ্ধে লক্ষ্মণের যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে রামচন্দ্রের ভয় ও স্ত্রীলোকের মত বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না -- "নাহি কাজ মিত্রবর সীতায় উদ্ধারি, / বৃথা, হে জলধি আমি বাঁধিনু তোমারে;' প্রভৃতি ঘটনায় রামায়ণের রামচরিত্রের দৃঢ়তার অভাব প্রকট হয়েছে এবং তাঁর মহত্ত্ব ও গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

মধুসূদনের রাম শোচনীয় ভাবে পৌরুষহীন, দুর্বল ও কোমল চরিত্র --- সমালোচকদের এই সমালোচনার প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে, বাল্মীকির রামচরিত্রেও অনেকক্ষেত্রেই উদ্ভ্রান্তি, অপ্রকৃতিস্থতা ও কাপুরুষতা আধুনিক পাঠকের পৌরুষ চেতনাকে লজ্জিত ও বিড়ম্বিত করে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বাল্মীকির আরণ্যকাণ্ডে লক্ষ্মণ যখন সীতার অনুরোধ এবং তাঁর দেওয়া বিচিত্র অমূলক অপবাদে বিধ্বস্ত হয়ে আশ্রমে সীতাকে একাকী রেখে অগ্রজ রামচন্দ্রের রক্ষার্থে রামের সম্মুখে উপস্থিত হল তখন সমস্ত ঘটনা শুনে রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা দেওয়া তো দূরে থাক, ক্রোধে ও বিরক্তিভরে লক্ষ্মণকে বলেছেন ---

'সর্বথা ত্বপনীতং তে সীতয়া যৎপ্রচোদিতঃ।
ক্রোধস্য বশমাগন্মো নাকরোৎশাসনং মম।।'

(আরণ্যকাণ্ড/৫৯ সর্গ/২৪নং শ্লোক)

(সীতার কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে তুমি যে আমার আদেশ লঙ্ঘন করেছ, তা তোমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে।)

এখানে আদর্শ অগ্রজ হিসাবে পরম অনুগত অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের এই আচরণ পক্ষপাতদোষ বিবর্জিতও নয়, মহত্ত্ব বা পৌরুষের পরিচায়কও তাকে বলা যায় না। এরপর আশ্রমে সীতাকে না দেখে রামের যে উদ্ভ্রান্তি ও অস্থিরচিত্ততা তাও তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা ও পৌরুষের সাক্ষ্য বহন করে না। তাছাড়া সীতার বিরহ বেদনায় আত্মহারা হয়ে রামচন্দ্র যে অসংলগ্ন আচরণ করেছেন তাও তাঁর চিত্ত ও চরিত্রের দৃঢ়তা বা পৌরুষের নমুনাও বলা চলে না, ---

'ইত্যেবং বিলপন্ রামঃ পরিধাবন্বনাদ্বনম্।
ক্বচিদুদ্ভ্রমতে বেগাৎ ক্বচিদ্বিভ্রমতে বলাৎ।।'

(আরণ্য / ৬০/৩৬)

(এইভাবে বিলাপ করতে করতে রাম বনে বনে সবেগে ভ্রমণ করতে লাগলেন, কখনও উল্লম্ফন, কখনও বা দিগ্‌বিদিগ ভ্রমণ করতে আরম্ভ করলেন; আবার কখনও উন্মত্তের ন্যায় দৃষ্ট হতে লাগলেন।)

সীতাবিরহে বাল্মীকির রামচন্দ্রের এই জাতীয় উদ্ভ্রান্তি ও উন্মত্ততা দেখে একালের পাঠকই শুধু বিব্রত হন না; সেকালের রামচন্দ্রের একান্ত অনুগত লক্ষ্মণও বিব্রত বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষ্মণ শত চেষ্টা করেও যখন রামচন্দ্রের চিত্তবিকলতা ও উন্মত্ততার অবসান ঘটাতে অক্ষম হলেন তখন তার অবস্থা শোচনীয়ভাবে করুণ ও লজ্জাকর। দুঃখে, লজ্জায় ও বেদনায় ব্যথিত লক্ষ্মণ সাধ্যমত চেষ্টা করেও রামের বিবেক ও চেতনা জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যে রামচন্দ্র বুদ্ধিমত্তা ও হৃদয়বত্তায় অনন্য চরিত্র, যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ চরিত্ররূপে পাঠকের কাছে উপাস্য ও অনুধ্যেয় হবেন; পত্নী বিরহের সূত্রপাতেই তাঁর এমন উন্মত্ততা ও উদ্ভ্রান্তি কতটুকু সমর্থনযোগ্য তা বিচার্য বিষয়।

অনেক সমালোচক মনে করেছেন, মধুসূদন রামচন্দ্রকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে মধুসূদনের রামচন্দ্রের দৃঢ়তা নেই, অনমনীয়তা নেই, কর্তব্যবুদ্ধির স্বাধীনতা নেই। কারণ তিনি উঠতে বসতে লক্ষ্মণ ও বিভীষণের মুখাপেক্ষী। বাল্মীকির রামচরিত্রে দুর্বলতা ছিল না। মধুসূদন এই রামকে বাংলাদেশের মঙ্গলকাব্যের দৈবানুগৃহীত দুর্বল নায়ক রূপে অঙ্কন করেছেন। আসলে এক্ষেত্রে সমালোচকদের মনে ক্রিয়াশীল ছিল বন্ধুকে লেখা মধুসূদনের চিঠির একটি অংশ - "I despise

Ram and his rabble." কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা যায়, মধুসূদন বাল্মীকির রামচরিত্রকে কোনরূপ হীনচরিত্র রূপে অঙ্কিত করেননি। মধুসূদন রামকে অতিরিক্ত কোমল হৃদয় এবং যুদ্ধ বিমুখ হিসেবে চিত্রিত করেছেন। রাবণ ও প্রমীলা রামচন্দ্রকে 'ভিখারী' বলে সম্বোধন করেছে ঠিকই; তবুও রাম সম্পর্কে কোনো হীন ইঙ্গিত করেননি। রাম চরিত্রের অতিরিক্ত কোমলতা ও দয়ার্দ্রতা তাঁর চরিত্রকে যুগোপযোগী হতে দেয়নি। রামের কাছে পত্নী উদ্ধারের চেয়ে ভাতৃপ্রেম বড়; তাই ভাতৃস্নেহে লক্ষ্মণকে মেঘনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে না দেওয়ার ভাবনায় এই কোমলতা ও দুর্বলতাগুলি ফুটে ওঠে।

কিন্তু বাল্মীকির রামায়ণের রামচন্দ্র চরিত্রেও তো এই দুর্বলতার পরিচয় কিছু কম নয়? সেখানেও তো দেখি লক্ষ্মণ ও বিভীষণের উপর রামচন্দ্রের পরম নির্ভরতা। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লক্ষ্মণ একদিকে রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন ও অন্যদিকে যুদ্ধে উৎসাহিত করছেন ---

'ন হ্যব্যবসিতঃ শত্রুং রাক্ষসং তং বিশেষতঃ।
সমর্থ স্ত্বং রণে হন্তুং বিক্রমে জিহ্মকারিণম্।।'

(কিষ্কিন্ধ্যা /২৭ / ৩৬)

(আপনি অধ্যবসায়শীল না হইলে সেই কপটচারী বিক্রান্ত রাক্ষসকে যুদ্ধে নিহত করতে সমর্থ হবেন না।)

যুদ্ধকাণ্ডেও দেখা যায়, বিভীষণ বিভিন্নভাবে বারবার ভগ্নমনোরথ ও বিষাদগ্রস্ত রামচন্দ্রকে প্রবোধ দিয়েছেন এবং রামের দুর্বলতা ও পৌরুষহীনতায় তিনি মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত বোধ করেছেন।

'ত্যজ রাজন্! ইমং শোকং মিথ্যাসন্তাপসমাগতম্।
তদিয়ং ত্যজ্যতাং চিন্তা শত্রুহর্ষবিবর্ধনী।।'

(যুদ্ধকাণ্ড / ৮৫ / ৮)

(হে রাজন্, আপনি অকারণ শোক পরিত্যাগ করুন। যে চিন্তায় শত্রুপক্ষের হর্ষ উৎপাদিত হয়, সেই তুচ্ছ চিন্তা মন থেকে দূর করুন।)

বাল্মীকির রামায়ণের রাম চরিত্রের এইসব দুর্বলতার পরিচয়ের পরেও যখন সমালোচকেরা মধুসূদনের রামচন্দ্রে কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার সামঞ্জস্যের শোচনীয় অভাবের অভিযোগ তোলেন, তখন সেই সমালোচনার নিরপেক্ষতা ও সংস্কারমুক্ত ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে আমাদের মনে। রামায়ণের সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যে শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে ব্যক্ত রামচন্দ্রের শোকের ভাব-ভাষা-সুরের মধ্যে যেটুকু তারতম্য ঘটেছে তা যুগগত কারণে। নইলে দুটি কাব্যেই পরম অনুগত লক্ষ্মণের প্রতি আদর্শ অগ্রজের মমতা ও স্নেহ প্রকাশিত হয়েছে; উভয়ক্ষেত্রেই রামচন্দ্র তাঁর অসহায় অবস্থার কথা করুণভাবে ব্যক্ত করেছেন। অযোধ্যায় ফিরে বিমাতা সুমিত্রা, ভ্রাতৃবধূ ঊর্মিলার কাছে কর্তব্যপালন ও কৈফিয়ৎ দেওয়ার কথাও দুটি কাব্যেই একই ভাবনায় চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও রামচন্দ্রকে দুর্বল হিসেবে দেখানোর অভিযোগে শুধুমাত্র আধুনিক কবি মধুসূদনকে অভিযুক্ত করা সঠিক নয় বলেই মনে হয়। কারণ লক্ষ্মণের জন্য শোকপ্রকাশের সূত্রে মধুকবির রাম যখন বলেছেন ---

'তবে যদি মম ভাগ্যদোষে --
চির ভাগ্যহীন আমি -- ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী?
*** *** ***
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে!

(মেঘনাদবধ - ৮ম সর্গ,পৃঃ ৮৭)

তখন এই রামচন্দ্র চরিত্রটিকে আমরা শুধুমাত্র করুণরসের আধার বলে ভাবতে পারি না, তার বীররসাশ্রিত মূর্তিটিও আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ, যথার্থ বীরত্ব শুধু মনোবল, সৎসাহস ও নির্ভীকতার মধ্যে আছে তা নয়; ত্যাগ-উদারতা-পরার্থপরতা-মহানুভবতার মধ্যেও প্রকৃত বীরত্ব ও মহত্ত্বের সূক্ষ্ম ও সুন্দর পরিচয় নিহিত। বিশেষত

মেঘনাদবধের নবম সর্গে পুত্র শোকাতুর রাবণের প্রতি রামচন্দ্রের ব্যবহারের মধ্যে তাঁর মহত্ত্ব ও উদারতা, ভদ্র ও সংস্কৃত রুচির পরিচয়ই ফুটে উঠেছে এসব উক্তিতে ---

'বিপদে অপর পর সম মম কাছে,
মন্ত্রিবর!'
(মেঘনাদবধ, নবম সর্গ, পৃঃ ১০৩)

অথবা

'আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুল শোকে!
এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে,
কুমার!.....
শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার তোষ তুমি তারে!'
(মেঘনাদবধ, ৯ম সর্গ, পৃঃ ১০৭)

মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্র নায়ক নন, প্রতিনায়কও নন; পার্শ্বিক চরিত্র। মধুসূদনের পূর্বে অনার্য রাক্ষসরাজ রাবণ সম্পর্কে যে এতদিনের ঘৃণা ও হীনভাব ছিল তা থেকে তাকে তুলে এনে কবি তাকে কাব্যের নায়কের বরমাল্য দিয়েছেন। আসলে এই যুগের সমস্ত বোধ ও বিশ্বাসকে মধুসূদন গ্রহণ করেছেন প্রসন্নতা ও উদারতার সঙ্গে। মেঘনাদবধের সকল চরিত্রেই দেখি যুগগত মানবধর্মের রসস্রোত প্রবাহিত। রাক্ষসজাতির ব্যবহার, হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম, স্নেহ-প্রীতি সম্পর্কে যে মানবেতর ও বর্বরোচিত মনোভাব ছিল; মধুসূদন সৃষ্ট রাবণ চরিত্র সম্পর্কে তার বিপরীত মনোভাবই পাঠক হৃদয়ে জাগ্রত হয়। বাল্মীকির রাবণের থেকে মধুসূদনের রাবণ বহুলাংশে পৃথক। বাল্মীকির রাবণ পরম অধর্মাচারী কপট বিভীষিকা-রূপী রাক্ষস। রামায়ণে তার পাপী চিত্র চিত্রণের প্রয়াসই দেখি। সেখানে রাবণ পাপ ও অধর্মের প্রতিমূর্তি। রাম ধর্ম, রাবণ অধর্ম; সুতরাং 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যৎ রাবণাদিবৎ'। এরূপ রাবণের মধ্যে যে শ্রদ্ধার যোগ্য কিছু থাকতে পারে তা মধুসূদনের পূর্বে অচিন্তনীয় ছিল। কিন্তু শুধুমাত্র ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যের মানদণ্ডে বিচার করলে মেঘনাদবধের রাবণের সঠিক পরিমাপ করা যাবে না। মধুসূদনের রাবণ অসভ্য বর্বর রাক্ষস নয়, বরং এক বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন বীর, রাক্ষসজাতির শক্তিশালী অধিনায়ক। রাবণের রাজসভার বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি কেবল অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী নন, সভ্য মার্জিত রুচি ও উন্নত কৃষ্টিরও অধিকারী। বাল্মীকির রাবণও কেঁদেছে, কিন্তু সে কান্না পাঠক আনন্দে উপভোগ করে, কারণ পাঠকের দৃষ্টিতে পাপী তার পাপের সমুচিত ফল পেয়েছে। অপমানিতা ভগিনী শূর্পনখার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার কারণে সীতাহরণ জনিত অপরাধ যতই সমাজের নীতি-বহির্ভূত কাজ হোক না কেন তাতে রাবণকে ঠিক পাপী হয়ত বলা চলে না। কারণ লঙ্কায় অশোকবনে রাবণ কখনও সীতাকে অসম্মান বা অশ্রদ্ধা করেন নি। তবুও এই ত্রুটিটুকু বাদ দিলে বলা যায় মেঘনাদবধের রাবণ শুধু একজন রাজা নন, পুত্রবৎসল পিতা, স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়-সংকল্প সম্রাট, স্নেহার্দ্রভ্রাতা, পত্নীপ্রেমিক স্বামী ও সর্বোপরি এক অমিত শক্তিশালী যোদ্ধা। মধুসূদনও রাবণকে কাঁদিয়েছেন; কিন্তু এই ক্রন্দন অনুতপ্ত পাপীর বিলাপ নয়; তা এক নিয়তি-তাড়িত ভাগ্যাহত মানুষের ক্রন্দন।

এই রাবণ চরিত্রটিকে অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে মধুসূদনের হাতে বাল্মীকির রামচন্দ্রের লজ্জাকর ও শোচনীয় লাঞ্ছনা এবং অবমাননা ঘটেছে বলে মনে করার কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা নেই। মেঘনাদবধের রাবণ চরিত্রের স্বরূপ ও স্বধর্মের সঙ্গে রামচন্দ্র চরিত্রের সৌসাদৃশ্যের ঘটনাগুলি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে এই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে সংশয় জাগে। প্রথমত দেখি রাম ও রাবণ দুজনেই সৌভাগ্যে ও সঙ্কটে চিরকালীন বাঙালির মতই একান্ত দেবতা নির্ভর। উভয়েরই প্রাণের কথা - 'ন চ দৈবাৎ পরং বলম্।' তাই পুত্র মেঘনাদকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে পিতা রাবণের উপদেশ ---

'তবে যদি একান্ত সমরে

ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্ট-দেবে -'
(মেঘনাদবধ, ১ম সর্গ, পৃঃ ১৩)

তেমনি ইন্দ্রজিৎ বধের পর অনুজ লক্ষ্মণ যখন আনন্দ উল্লাসে অগ্রজ রামকে এই বিজয় সংবাদ জানাতে এসেছিলেন তখন রামচন্দ্রও অনুরূপ মনোভাবের পরিচয়ই তুলে ধরেছেন ---

'পূজ, কিন্তু, বলদাতা দেবে,
প্রিয়তম! নিজ বলে দুর্বল সতত
মানব; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে।'
(মেঘনাদবধ, ষষ্ঠ সর্গ, পৃঃ ৭২)

দ্বিতীয়ত দেখি, জীবনের বিপর্যয় ও কঠিন পরিস্থিতিতে বেদনা আক্ষেপ প্রকাশে রাম ও রাবণের ভাষা ও সুরের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। মধুসূদনের দৃষ্টিতে আর্ত ও বিপর্যস্ত মানুষ রাম-রাবণের মনোগত কথা ও ব্যথা একই। তাই শক্তিশেলে আহত লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে রামচন্দ্রের উক্তি ---

'..... আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি,
পূজিনু দেবতা কুলে -- দিলা কি দেবতা
এই ফল?'
(মেঘনাদবধ, ৮ম সর্গ, পৃঃ ৮৮)

অনুরূপ আক্ষেপোক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায় সমুদ্রতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর সৎকারকল্পে উদ্যোগী ভগ্নহৃদয় পিতা রাবণের কথায় ---

'সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল?'
(মেঘনাদবধ, ৯ম সর্গ, পৃঃ ১০৯)

চিরকালের নিয়তি তাড়িত সকল অসহায় মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে রাম-রাবণের মধ্যে কোনো পার্থক্য কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

তৃতীয়ত বলা যায়, রাবণ চরিত্রের পুরুষকার ও শৌর্য যে রামচরিত্রে একেবারে অনুপস্থিত, তাও নয়। কাব্যমধ্যে এর অনেক উদাহরণ দেখা যায়। যথার্থ বীরের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ -- শত্রু মিত্র নির্বিশেষে গুণীর সম্মান করা। এই বীরত্বের ও মহত্ত্বের আদর্শে মধুসূদনের রাম - রাবণের মধ্যে কোন দুস্তর ব্যবধান আমাদের চোখে পড়ে না। যেমন নবম সর্গে রামচন্দ্র সারণকে বলেছেন ---

'পরমারি মম,
হে সারণ, প্রভু তব; তবু তাঁর দুঃখে
পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে!'
(মেঘনাদবধ, ৯ম সর্গ,পৃঃ ১০৩)

রাবণ চরিত্রেও একই আদর্শ ও একই মনোভাবনা সক্রিয় --

'তব বাহুবলে, বলি' বীরশূন্য এবে
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি!'
(মেঘনাদবধ, নবম সর্গ, পৃঃ ১০২)

এরপরও কি বলা চলে যে মধুসূদন মেঘনাদবধে রামের প্রতি অবিমিশ্রভাবে ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, রাবণই এই কাব্যে কবিহৃদয়ে একচেটিয়া ভাবে শ্রদ্ধার আসন অধিকার করে আছেন? আসলে মেঘনাদবধ কাব্য একান্তই ভারতীয় তথা বঙ্গীয় সৌন্দর্য-চেতনা ও জীবন-ভাবনার অনুরূপ ও অনুকূল। এই কাব্য ঊনিশ শতকের নবযুগের নবজাগ্রত বাঙালি ও ভারতবাসীর নব মহাকাব্য।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

বাল্মীকি রচিত ও হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত *রামায়ণ* , ১ম প্রকাশ, ১৯৮৪, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, কলিকাতা - ৭০০০০৯।

ভট্টাচার্য সুখময়, *রামায়ণের চরিতাবলী*, ১ম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলিকাতা - ৭০০০০৯।

সেন দীনেশচন্দ্র, *রামায়ণী কথা* , সপ্তম সংস্করণ, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

মজুমদার উজ্জ্বলকুমার সম্পাদিত, *মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা*, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, সোনার তরী, কলকাতা - ৭০০০৫৭।

দত্ত ভবতোষ, *কাব্যবানী* , প্যাপিরাস সংস্করণ, ১৯৯১, কলিকাতা - ৭০০০০৪।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী সুকুমার সম্পাদিত *মেঘনাদবধ কাব্য* , ষোড়শ সংস্করণ, ১৯৮৩, মডার্ণ বুক এসেন্সী প্রাঃলিঃ, কলিকাতা - ৭০০০৭৩।

দাস শিশির কুমার, *মধুসূদনের কবিমানস*, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৯, পুস্তক বিপণি, কলিকাতা - ৭০০০০৯।

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *মেঘনাদবধ কাব্যজিজ্ঞাসা* , ১ম প্রকাশ, ১৯৭৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃলিঃ, কলিকাতা - ৭০০০১২।

চৌধুরী শ্রী ভূদেব, *বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা* (২য় পর্যায়) , নূতন প্রথম প্রকাশ, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৭৩, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃলিঃ, কলিকাতা - ৭০০০০৭।

সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, করিমগঞ্জ কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম